সালাফ সিরিজ-৬

নিজামুদ্দিন আসির আদরাবি

মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবি রাহ.

সালাফ সিরিজ-৬

মুজাহিদে ইসলাম

মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবি রাহ.

নিজামুদ্দিন আসির আদরাবি

অনুবাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪০০, US $ 15. UK £ 10

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96854-8-7

Maulana Rahmatullah Kairanwi
by **Nizamuddin Asir Adrawi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিতার্কিক আলিম মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবির নাম আজ আমাদের থেকে বিস্মৃত হওয়ার পথে। বিপ্লবী এই মুজাহিদের বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে লেখক গ্রন্থটিতে তুলে ধরেছেন। মূল্যবান গ্রন্থটি আপনাদের হাতে আমরা তুলে দিতে পেরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি।

উর্দু ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেছেন সুলেখক নিজামুদ্দিন আসির আদরাবি। মিশনারিদের নানামুখী আগ্রাসনের এই সময়ে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা গ্রন্থের বেশ প্রয়োজন ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, লেখকের এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বাংলাভাষীদের জন্য সেই শূন্যস্থান পূরণ করে দিয়েছেন।

মূল গ্রন্থে সূচি দুইভাবে দেওয়া—সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত। আমরা শুধু সংক্ষিপ্ত সূচি রেখেছি। যদিও এতে অনেক বিষয় স্পষ্ট হতো সূচি দেখলেই; কিন্তু কলেবর না বাড়াতেই এটা করা হয়েছে। এ ছাড়া উপশিরোনামগুলো বিন্যাস করা হয়েছে। বিভিন্ন নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণের পাশাপাশি ব্র্যাকেটে ইংরেজিও দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটির ভাষাসম্পাদনা ও প্রুফ সমন্বয়ের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আলী আহমদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত।

গ্রন্থে কোনো ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করুন। প্রতিটি কাজের উত্তম বিনিময় দিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তাআলা প্রতি যুগে ফিরআউনের মোকাবিলায় একজন মুসা পাঠান। বাতিল যুগে যুগে ছিল এবং তারই সঙ্গে হক তার মোকাবিলায় প্রস্তুত ছিল। বাতিলের ক্ষমতা ও আধিপত্যের কাছে হকের আলো নিভু নিভু হয়ে যায়; কিন্তু নেভে না। হক হচ্ছে ছাইচাপা আগ্নেয়গিরির মতো; যেকোনো সময় সেখান থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে।

ভারতবর্ষ দীর্ঘসময় মুসলিমদের শাসনে ছিল। সুদূর আরব আর খোরাসান থেকে এসে তারা এই বিশাল ভূখণ্ডে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। শেষপর্যন্ত আফগানদের হাত হয়ে ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় এখানকার ক্ষমতা। কিন্তু এরই মধ্যে মুসলিমরা প্রায় সাড়ে ৮০০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করেন।

আজ ভারতের মুসলিমরা নির্যাতিত, নিপীড়িত। গরুর মাংস রাখার মতো ঠুনকো আর মিথ্যা অভিযোগে রাস্তায় ফেলে উন্মুক্ত ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে নির্মমভাবে পিটিয়ে মারা হচ্ছে মুসলিমদের। পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আগুনে। বর্তমানে ভারতে হিন্দুদের আধিপত্য, যেহেতু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারতের অধিবাসী অন্য ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারলেও কেবল মুসলিমদের আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে।

কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এমন সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়েছিল। যখন এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ বেনিয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তারা সমগ্র হিন্দুস্থানের মানুষকে খ্রিষ্টান বানাতে উঠেপড়ে লাগে। তাদের প্রথম টার্গেট ছিল মুসলিমজাতি। কারণ, বেনিয়াগোষ্ঠী মুসলিমদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। মুসলিমরা সংখ্যালঘু ছিল বিধায় বেনিয়ারা ভেবে নিয়েছিল এরা হবে সবচেয়ে দুর্বল। তাই প্রথমে এদের খ্রিষ্টান বানাতে পারলে পরের ধাপে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের খ্রিষ্টান বানানো সহজ হবে। পরিকল্পনা নিয়ে তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং সাফল্য তাদের হাতে ধরাও দিয়েছিল। কিন্তু তারা সেই সাফল্যের স্বাদ আর নিতে পারেনি। ওই যে 'ফিরআউনের মোকাবিলায় মুসা থাকে', সেই নিয়মে ব্রিটিশ বেনিয়াদের মোকাবিলায় এক সিংহ গর্জে ওঠেন। তাঁর অফুরন্ত ইমানি বল আর

ইসলাম হিফাজতের অদম্য ইচ্ছাশক্তি হিন্দুস্থানের মানুষকে বেনিয়াদের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করে। সেই বিজয়ী সিংহের নাম ছিল মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবি রাহ.।

ভারতের ইতিহাসে তিনি যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা কখনোই মুছে যাওয়ার নয়। তাঁর অসীম সাহস, দীনের প্রতি একান্ত ভালোবাসার কারণে নিজের সহায়সম্বল হারান। এমনকি নিজের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর অসামান্য অবদানের ফলে ভারতের মুসলিমরা এবং ব্যাপকভাবে সমগ্র হিন্দুস্থানের মানুষ খ্রিস্টধর্মের কবল থেকে রক্ষা পায়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, তাঁর নাম-কৃতিত্ব যেন আজ বিস্মৃতির অতলগহ্বরে। সাধারণ মানুষ তো জানেই না, এমনকি মুসলিম শিক্ষার্থীদের মধ্যেও তাঁর নাম-শোনা লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদে ইসলাম মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবির বিপ্লবী জীবন নিয়ে রচিত নিজামুদ্দিন আসির আদরাবির গ্রন্থটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে অনুবাদের তাওফিক দিয়েছেন। গ্রন্থটি আমি অনুবাদ করি মাওলানা ইমরান রাইহানের পরামর্শে; প্রায় চার বছর আগে। এরপর কালান্তর প্রকাশনীর আবুল কালাম আজাদের কাছে প্রকাশের প্রস্তাব দিলে তিনি সানন্দে রাজি হন। তাঁর পরামর্শ আর নিজের মতো করে গুছিয়ে কাজ করতে গিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশে এতটা দেরি হলো। সঙ্গে আমার কিছু অলসতা আর ব্যস্ততাও ছিল।

প্রকাশিত গ্রন্থ হিসেবে এটি আমার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। এই হিসেবে আমার ত্রুটিবিচ্যুতি থাকাটা একেবারে স্বাভাবিক। আপনারা আমার দুর্বলতা, অযোগ্যতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন, এতে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। বইটিকে কবুল করুন। আমাদের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন ক্ষমা করে দেন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
২৪ এপ্রিল ২০১৯

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১০

প্রথম অধ্যায়

নাম, বংশপরিচয় ও জন্মস্থান # ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম, শিক্ষাজীবন ও শিক্ষকতা # ৩০

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম ভারতে খ্রিস্টান মিশনারি আগ্রাসন # ৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

ময়দানে মাওলানা কিরানবি # ৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

পাদরি ফ্যান্ডারের সঙ্গে চিঠিবিনিময় # ৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিতর্কের পারিপার্শ্বিক অবস্থা # ৮৬

সপ্তম অধ্যায়

প্রথমবারের মতো বিতর্কসভা # ৯১

অষ্টম অধ্যায়

বিকৃতির বিষয় সম্পর্কে আলোচনা # ১০২

নবম অধ্যায়

বিতর্কের দ্বিতীয় দিন # ১১৪

দশম অধ্যায়

মাওলানা কিরানবির ঐতিহাসিক অবদান # ১২৭

একাদশ অধ্যায়
জিহাদে আকবর ও শানদার বিজয় # ১৩২
দ্বাদশ অধ্যায়
বিতর্কের পর # ১৩৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিতর্কের কারগুজারি # ১৬১
চতুর্দশ অধ্যায়
মাওলানার অমূল্য রচনাবলি # ১৬৫
পঞ্চদশ অধ্যায়
ইজহারুল হক : খ্রিষ্টবাদ খণ্ডনে অনন্য গ্রন্থ # ১৬৯
ষোড়শ অধ্যায়
১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব ও পরবর্তী সময়ের অবস্থা # ২২৫
সপ্তদশ অধ্যায়
মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবির হিজরত # ২৩৩
অষ্টাদশ অধ্যায়
শত্রুর উপকার # ২৩৭
ঊনবিংশ অধ্যায়
মক্কায় মাওলানা কিরানবি # ২৪১
বিংশ অধ্যায়
শিক্ষা সংস্কারে চেষ্টা-প্রচেষ্টা # ২৪৮
একবিংশ অধ্যায়
শত্রুতা যখন উপকারী # ২৫৩
দ্বাবিংশ অধ্যায়
কর্মময় জীবন : দেশ দেশান্তরে # ২৬০

ভূমিকা

খ্রিষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি সময়ে মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবির নাম প্রথমবারের মতো আলোচনায় আসে; যখন তিনি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য বিরাট অবদান রাখেন। তখনই পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম। তারপরই মূলত ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে পুরো পৃথিবীতে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। অতীতে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ঘোড়ার পদধ্বনিতে যেমন খ্রিষ্টবিশ্বের রাতের ঘুম হারাম হয়েছিল, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীতে এসে যাজক, পাদরি আর মিশনারিদের ঘরোয়া সভা-সমাবেশে মাওলানা কিরানবির নামটাই তাদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মাওলানা ভারতবর্ষের এমন এক সংকটাপন্ন সময়ে ইসলামের সুরক্ষার জন্য লড়াই শুরু করেন, যখন তা ধ্বংসের একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত। সেই সময়ে ভারতবর্ষের বুক থেকে ইসলামের নামনিশানা মুছে দিতে এক স্বৈরাচারী সরকার তার শক্তি-সামর্থ্যের সবটুকু নিয়ে মাঠে নামে। কিন্তু আল্লাহ এই অশুভ শক্তিকে দমানোর জন্য মাওলানার মতো কীর্তিমান মনীষীকে চয়ন করেন। তিনি খ্রিষ্টানদের বাঁধভাঙা জোয়ারের মুখে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন; যা জোয়ারের উত্তাল ঢেউকে থামিয়ে দেয়।

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নিজেদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের উদ্দেশ্যে ধর্মের পোশাক গায়ে জড়ানোর কৌশল অনেক আগে থেকেই প্রয়োগ করছিল। আজ থেকে প্রায় ২৫০ কিংবা ৩০০ বছর আগে স্পেনে তারা এই কৌশল প্রয়োগ করে সফলও হয়। তাদের ঐক্যবদ্ধ সামরিক বাহিনী এবং শঠতাপূর্ণ ও ধুরন্ধর রাজনৈতিক কূটচাল স্পেনে মুসলিমদের ৯০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল শাসনের অবসান ঘটায়। তারপর সমগ্র স্পেনে যখন তাদের দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তারা নিজেদের এই সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কৌশল গ্রহণ করে; যা বাস্তবায়ন করতে তারা পাদরিদের বিশাল অংশকেও মাঠে নামিয়ে দেয়। কিন্তু যখন অনুভব করে, এভাবে কার্যসিদ্ধি হতে বেশ সময় লাগবে, তখন তারা আশ্রয় নেয় জোরজবরদস্তির। অস্ত্রহাতে সবাইকে ক্রুশের সামনে নত হতে বাধ্য করে। তখন

যারাই নত হতে অস্বীকার করেছে, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে তাদের নিক্ষেপ করেছে। এভাবে তাদের অনুসৃত এই কৌশল সফলতার মুখ দেখে এবং একসময় সমগ্র স্পেনে ক্রুশপূজারিদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত এতই দৃঢ় হয় যে, একজন একত্ববাদে বিশ্বাসী স্পেনের মাটিতে নিশ্বাস ফেলার অধিকারটুকুও হারিয়ে ফেলে।

কোনো মুসলিমকে তাদের ৯০০ বছরের গৌরবময় শাসন ও ঐতিহ্যের শেষ পরিণতি দেখার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যেখানে তারা ৯০০ বছর ধরে শক্তি, প্রতিপত্তি ও গৌরবের সঙ্গে শাসনকাজ পরিচালনা করেছে, সেখানে আজ তাদের থেকে দাসের মতো শাসিত হয়ে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। ক্রুশের পূজারিরা চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঘোষণা করে, 'এই দেশে থাকতে হলে হয়তো খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করো, নয়তো দূরের কোনো জঙ্গলের বাসিন্দা হও। এ দেশে থাকতে চাইলে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হতেই হবে। বিকল্প কোনো পথ নেই। আর দ্বিতীয়বার স্পেনের দিকে ফিরে তাকানোরও অধিকার নেই তোমাদের। এরপরও যদি ফিরে তাকাও, তবে তোমাদের বিচ্ছিন্ন ধড়ও নিজেদের পায়ের নিচে দেখতে পাবে।'

ইতিহাস বলে, স্পেনে প্রতিদিন ৫০ হাজারেরও অধিক মুসলিমকে ব্যাপটিজমের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হতো।[১] কাপুরুষ, আত্মমর্যাদাহীন আর ইমানের ওপর জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া লোকদের সবাই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। যাদের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল শক্ত, ইমান ছিল হিমালয়ের চেয়েও দৃঢ়; যাদের কাছে জীবনের চেয়ে ইমানের মূল্য ছিল বেশি, তারা চিরদিনের জন্য স্পেনকে বিদায় জানায়। তাদের কয়েক প্রজন্ম উদ্‌বাস্তুর মতো ঘুরেফিরে জীবন কাটায়।

শাসকগোষ্ঠী ভোগবিলাসে মত্ত থাকায় মুসলিমদের এমন করুণ পরিণতির শিকার হতে হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠীর মূল সমস্যা ছিল, তারা মনে করত সম্পদ ও রাজ্য দুটোই তাদের। তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার কিংবা ক্ষমতা কারও নেই। তখনকার আলিমসমাজ ছিল সরকার ও প্রশাসনের নৈকট্য অর্জনে ব্যস্ত। ধনসম্পদের পাহাড় গড়াকেই তারা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছিল। রমরমা হয়ে উঠেছিল পির-মুরিদির ব্যবসা। লোপ পেয়ে গিয়েছিল তাদের আত্মমর্যাদাবোধ। ইমানি চেতনা ও দীনের জন্য উৎসর্গের মানসিকতা বিরল বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। যখন খ্রিষ্টানরা তাদের ওপর হামলা চালায়, তখন তথাকথিত এই আলিমরা কাপুরুষের মতো বিধর্মীদের কাছে ক্ষমাভিক্ষার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ভোগবিলাস আর আরাম-আয়েশের বস্তুসামগ্রী হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে মহিলাদের মতো বিলাপ করে অশ্রু ঝরাতে থাকে।

[১] ব্যাপটিজমের সাধারণ অর্থ হচ্ছে রাঙানো। এটা মূলত খ্রিষ্টধর্মের একটি প্রথার নাম। শিশুর জন্মের পর তার মাথায় গির্জার পবিত্র পানি ছিটিয়ে তাকে খ্রিষ্টান হিসেবে মেনে নেওয়া।

ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, ইমানের সমুজ্জ্বল প্রদীপ নিভে যাচ্ছে, সেটা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ইমানের হিফাজত ও ইসলামের সুরক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার কোনোরূপ চিন্তাচেতনা তাদের মধ্যে আর বাকি থাকেনি। হারিয়ে যায় ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের আগ্রাসন রুখে দেওয়ার মতো প্রেরণা, শক্তি ও সাহস। অবস্থা তো এমন করুণ পর্যায়ে চলে যায় যে, গ্রানাডার শাসক আবু আবদুল্লাহ[১] রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলার হাতে দুর্গের মালিকানা তুলে দিয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বোন আয়েশার কাছে আসে। আয়েশা তাঁর ভাইকে তখন যে কথাগুলো বলেছিলেন, ইতিহাস তা সোনার হরফে লিখে রেখেছে; কালের দুর্বিপাকে হারাতে দেয়নি। তিনি বলেছিলেন,

> যেহেতু তোমরা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলিমের মতো বীরবিক্রমে জীবনবাজি রেখে শাসনক্ষমতা ধরে রাখতে পারোনি, আজ মহিলাদের মতো বিলাপ করে আর কী লাভ? তোমাদের তো (হাঁটুপানিতে) লজ্জায় ডুবে মরা উচিত। তোমরা ইসলামের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছ, পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ইতিহাসকে ধূলিসাৎ করেছ। এমন ভাইয়ের বোন হওয়া আমার জন্য চরম লজ্জার!

স্পেনে ক্রুশপূজারিদের মোকাবিলায় মুসলিমদের কাপুরুষতা ৯০০ বছরের পরিশ্রমে তিলে তিলে গড়ে তোলা মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও স্মৃতিচিহ্নগুলো এমনভাবে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, যেন ইতিপূর্বে সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মুসলিম স্থাপত্যের বিস্ময় আল হামরা প্রাসাদের উপর পতপত করে উড়তে থাকা ইসলামের ঝান্ডা ভূলুণ্ঠিত করে সেখানে স্থাপন করা হয় ক্রুশের পতাকা। মর্যাদা-মাহাত্ম্য ও নান্দনিকতার বিচারে পৃথিবীর অদ্বিতীয় মসজিদ, স্পেনের মুসলিম শাসনের গৌরবের স্মারক কর্ডোবা জামে মসজিদও খ্রিষ্টানদের দখলে চলে যায়। তারা ঐতিহাসিক মসজিদটিকে গির্জা বানিয়ে দেয়।

যে দিন স্পেনে মুসলিম-শাসনের অবসান ঘটে, সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত স্পেনের আকাশে-বাতাসে মসজিদের সুউচ্চ মিনার থেকে আজানের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়নি।

---

[১] **আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ** : গ্রানাডার ২২তম এবং শেষ শাসক। পুরো নাম মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনু সাআদ ইবনু আলি ইবনু ইউসুফ মুসতাগনি বিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইবনু ইসমাইল ইবনু ফারাজ ইবনু ইসমাইল ইবনু ইউসুফ। তিনি বনু নাসর বা আরবের কাহতানি এবং মদিনার খাজরাজ গোত্রের শাখা বনু আহমারের বংশধর ছিলেন। দুই দফা গ্রানাডা শাসন করেছে। প্রথম দফা—১৪৮২ থেকে ১৪৮৩ খ্রি. পর্যন্ত; আর দ্বিতীয় দফা—১৪৮৬ থেকে ১৪৯২ খ্রি. পর্যন্ত। উপাধি ছিল আল গালিব বিল্লাহ। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির ২ তারিখে তিনি সম্রাট ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। স্প্যানিশরা তাকে 'el chico বা পিচ্চি ছেলে' বলে ডাকত।—সম্পাদক।

এত সুন্দর, সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা ভূখণ্ড, মুসলিমদের ৮০০ বছরের পরিশ্রমে সাজানো বাগান আজ একেবারেই মুসলিমশূন্য। আজও কোনো মুসাফিরের জন্য কর্ডোবা জামে মসজিদে দু-রাকাত নামাজ পড়া সম্ভব নয়। স্পেনের পরাজয় মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। স্পেনের ইতিহাস একজন চিন্তাশীল মানুষের বিবেকের দুয়ার খুলে দেয়। তার চিন্তার জগতকে নাড়িয়ে দেয়। অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়। আন্দোলিত করে শিরা-উপশিরায় বহমান রক্তকে। স্পেন আজও পৃথিবীর মানচিত্রে আছে। তবে মুসলিমদের হয়ে নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর ৯০০ বছরের গৌরবময় ইতিহাস ও হারানো ঐতিহ্যের বেদনাবিধুর ইতিহাস হয়ে।

স্পেনে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় ১০০ বছর পর ভারতবর্ষেও খ্রিষ্টানরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চেয়েছিল। ভারতের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে মুসলিমদের সবদিক থেকে কোণঠাসা করতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কাজে তারা আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি সব যুগেই ফিরআউনের মোকাবিলায় একজন মুসার আবির্ভাব ঘটান। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ক্রুশপূজারি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা একজন বীর-শার্দূল মুজাহিদের আবির্ভাব ঘটালেন, যিনি নিজের ইমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যা প্রচণ্ড প্রতাপশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মাথার মুকুট পর্যন্ত মাটিতে আছড়ে ফেলেছিল। নস্যাৎ করে দিয়েছিল তাদের সব ষড়যন্ত্র।

ইতিহাসের ছাত্রদের এটা জানা থাকার কথা যে, ব্রিটিশরা এ দেশে দখলদার হয়ে আসেনি; এসেছিল বণিকবেশে। তাদের ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল *ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি*। বাংলা ও মাদরাজে তারা বাঁশ, ভুসি, মাছ ও নীল ইত্যাদির ব্যবসা চালাত। ব্যবসার মুনাফা থেকে প্রয়োজন মেটানোর পর বাকিটা দেশে পাঠিয়ে দিত। ঠিক আজ আমাদের দেশের লোকজন যেভাবে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়ে রোজগার করে নিজের খরচ চালিয়ে পরিবারের জন্য টাকা পাঠায়; একই অবস্থা ছিল ব্রিটিশ বেনিয়াদের। কিন্তু তারা ব্যবসা করতে গিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে। তারা দেখতে পায়, এ দেশের মানুষের ইমান খুব নড়বড়ে।

ভারতবর্ষে তখন গোত্রীয় ও আঞ্চলিক শাসন চলছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে দেশব্যাপী ছোট ছোট অসংখ্য স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। প্রত্যেক শাসক নিজের রাজ্য টিকিয়ে রাখতে নানা ফন্দি-ফিকির ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আবার রাজ্যের রাজা হওয়ার জন্য তাদের অনেকে পারিবারিক কলহেও জড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি রাজ্যে শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ক্ষমতা দখলের জন্য একদল লোক গোপনে কাজ করত। ইংরেজরা এই দিকটাও ভালোমতো জানত। এদিকে ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যিক

নিরাপত্তার জন্য ছোটখাটো একটা সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। এই বাহিনীর সদস্যরা ছিল ইউরোপের বদমাশ, দাগী অপরাধী, জারজ সন্তান, পলাতক আসামি এই জাতীয়। কোম্পানি এ রকম লোককে সেনাবাহিনীতে চাকরির সুযোগ করে দেয়।, এদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেয়। এরা ছিল জঘন্য ধরনের রক্তপিপাসু ও দাঙ্গাবাজ। যদিও এই বাহিনী গঠনের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপত্তা দেওয়া; কিন্তু এরাই পরবর্তীকালে ইংরেজদের বিজয়ের ধারা জারি করে।

এই সময়ে বাংলা প্রদেশে সিরাজুদ্দৌলার মসনদ দখলের জন্য রশি টানাটানি হয়। সিরাজুদ্দৌলাকে বিতাড়িত করে মির কাসিম মসনদ দখলের চেষ্টা করে। এতে ইংরেজদের সহায়তা চায়। তাকে সাহায্য করতে একপায়ে খাড়া হয়ে যায় কোম্পানি। প্রথমত তারা সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মির জাফরকে লোভ দেখিয়ে কিনে নেয়। যখন যুদ্ধের ময়দানে সিরাজুদ্দৌলা ও ইংরেজবাহিনী মুখোমুখি হয়, তখন সিরাজুদ্দৌলার সেনাবাহিনীর কামানে গোলার পরিবর্তে ধুলো ঢুকানো ছিল। এটা ছিল মির জাফরের ষড়যন্ত্র। ফলস্বরূপ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সিরাজের ৪০ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী ইংরেজদের কয়েক হাজার সেনার কাছে পরাজিত হয়। মির কাসিম মসনদ লাভ করে।

এই যুদ্ধে সাহায্য করার কারণে তারা যে পরিমাণ টাকা পায়, তা তাদের সারা বছরের ব্যবসার আয় থেকে অনেক বেশি ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, এই যুদ্ধের সূত্র ধরে বাংলার শাসনব্যবস্থায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এক নবাবকে সরিয়ে আরেকজনকে বসিয়ে তারা বুঝতে পারে, আগামীতেও তাদের মর্জিমতো দেশ না চালালে বর্তমান নবাবকে সরিয়ে আরেকজনকে বসিয়ে দিতে পারবে। বাস্তবেও তা-ই করেছিল। তারা যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় বসাত আবার যখন ইচ্ছা সরিয়ে দিত। আর এই বদলাবদলির ফাঁকে তারা বিশাল অঙ্কের অর্থ পেত। কর্নাটকে মুহাম্মাদ আলি ও চাঁদশাহের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে একই নাটক মঞ্চস্থ করে। মহিশূরে টিপু সুলতানের সেনাপতি মির সাদিককে লোভ দেখিয়ে কিনে নেয়। তাদের সঙ্গে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে প্রবল পরাক্রমশালী রাজ্য তছনছ করে। যে মারাঠি শক্তিকে অপরাজেয় মনে করা হতো, ব্রিটিশরা সেই দুর্দান্ত শক্তিকেও নাকে রশি লাগিয়ে অনুগত দাস বানিয়ে ফেলে। হায়দারাবাদকে সেনাবাহিনীর অধীনে নিয়ে এসে পঙ্গু করে দেয়। হায়দারাবাদের শাসক ইংরেজদের অনুমতি ছাড়া নড়াচড়া করারও স্বাধীনতা ছিল না। লক্ষ্ণৌয়ের শাসক ওয়াজিদ আলিকে বেচাকেনার পর লক্ষ্ণৌ থেকে বহিষ্কার করে কলকাতার মাটিয়া মহল দুর্গে নজরবন্দি করে রাখে।

এভাবে চলতে চলতে একসময় দিল্লির মসনদের ওপরেও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আস্তে আস্তে দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে বেতনভোগী কর্মচারী বানিয়ে পঙ্গু করে দেয়। এভাবেই কেবল কৌশল অবলম্বন করে

কোনো বড়সড় সেনা অভিযান কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই সমগ্র ভারতে তাদের ক্ষমতা সুসংহত করতে সক্ষম হয়। তাদের ক্ষমতা ও শক্তি এতই প্রভাব-প্রতিপত্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, মুষ্টিমেয় ইংরেজের সামনে অসংখ্য ভারতীয় নাগরিক দাঁড়ানোর সাহস পেত না। কোনো ইংরেজ কোনো বড় জনসভার পাশ দিয়ে গেলে জনসভা রুটির খামিরের মতো ফেটে যেত—যে যেদিকে পারত দৌড়ে পালাত। এমতাবস্থায় ব্রিটিশদের পা তখন মাটিতে ছিল না, তাদের মেজাজ তখন আসমান-ছোঁয়া। তারা এখানে বসে লুটপাট করে লন্ডনে অর্থ পাচার করত; আর লন্ডনে চলত ভোগবিলাসের যাবতীয় আয়োজন।

দখলের পর কোম্পানির জন্য আবশ্যক ছিল এটাকে টিকিয়ে রাখা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করা। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা। এমন সেনাবাহিনী, যারা হবে একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। এ রকম সেনাবাহিনী গঠন করতে হলে ভারতের বিভিন্ন দল ও উপদলের ওপর মোটেও নির্ভর করা উচিত হবে না। আবার পুরো দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এই পরিমাণ লোক ইউরোপ থেকে নিয়ে আসাও সম্ভব নয়। সুতরাং তারা এখানকার স্থানীয় হিন্দু, মুসলিম ও শিখদের সমন্বয়ে একটি মিশ্র বাহিনী গঠন করে। মোগল আমলেও এ রকমই মিশ্র সেনাবাহিনী ছিল।

মোগল আমলের সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ ব্রিটিশদের অনুগত হয়। তারপরও ব্রিটিশরা কখনো ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর আস্থা রাখত না। কর্নেল, জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার ইত্যাদি শীর্ষ পদে কোনো ভারতীয়কে নিয়োগ দেওয়া হতো না। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা পদে কেবল ইংরেজদেরই নিয়োগ দেওয়া হতো। ভারতীয়দের সাধারণ সেনা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তাদের নিযুক্ত অফিসাররা সবসময় সাধারণ সেনাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত—বলা তো যায় না কখন তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের সুপ্ত-বাসনা বহ্নিশিখা হয়ে প্রকাশ পায়; আর সেই আগুনে কোম্পানির শাসন পুড়ে ছারখার হয়ে যায়! কোম্পানির পরিচালনা-পর্ষদ লন্ডনের শীর্ষ বুদ্ধিজীবী ও ইংল্যান্ডের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, যেভাবে ইতিপূর্বে স্পেন দখল করে সেখানে তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেছে; সেই একই কায়দায় ভারতেও তাদের ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করবে।

স্পেনে তারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে পুরো দেশের মানুষকে খ্রিষ্টান বানিয়ে ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করে অপরাজেয় বানিয়েছিল। একই পদ্ধতিতে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশকে খ্রিষ্টান বানিয়ে তারা তাদের ক্ষমতা শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। যখন শাসক ও শাসিতের ধর্ম এক হয়ে যায়, তখন আর এত বেশি শত্রুতা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সরকারের অনুগত ও বিশ্বস্ত হয়। অধিকাংশ মানুষ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নিলে তাদের রাজত্ব আশঙ্কামুক্ত হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের পরিকল্পনা।

স্পেনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর সেখানে তাদের শাসন টিকে থাকার

কারণ ছিল—মুসলিমরা পরাজিত হওয়ার পর স্পেনে খ্রিস্টান ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষ বসবাস করত না। যারা মুসলিম ছিল তাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো হয়। কোম্পানির পরিচালকরা এই অভিজ্ঞতার কথা সামনে রেখে এগোতে থাকে। ইংল্যান্ড সরকারের কাছে কোম্পানির পরিচালনা-পর্ষদের এই প্রস্তাব যুক্তিসংগত মনে হয়। লন্ডন পার্লামেন্টে এই বিল পাশ করা হয়। তারপর তারা ভারতের স্থানীয় লোকজনকে খ্রিস্টান বানানোর মিশনে নেমে পড়ে।

শহরের বাইরে যেখানে সাধারণ মানুষের চলাচল নেই, এমন একটা জায়গায় খুব সুরক্ষিত করে তারা একটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। শহর এলাকার যুবকদের ইসলাম শেখানোর জন্য মাদরাসায় ভর্তি করা হয়। লেখাপড়াকালে তাদের পর্যাপ্ত ভাতা ও লেখাপড়া শেষ করার পর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বড় অঙ্কের টাকা দেওয়া হতো। আইন ছিল মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ছাড়া বাইরের কোনো লোক সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি কোনো কারণে কাউকে প্রবেশ করতে অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে ইংল্যান্ড সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হতো। মূল সড়ক থেকে যে ছোট সড়ক মাদরাসার দিকে গিয়েছে, সেই সড়কের প্রবেশদ্বারে মোটা হরফে লেখা ছিল—'এই সড়ক সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়।'

সরকারের অনুমতি নিয়ে প্রবেশের কথা ছিল বাহানামাত্র। এটা কেবল আইনের গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবতা হলো, কেউ কোনোদিন সেই গোপন মাদরাসায় প্রবেশের অনুমতি পেত না। সরকারের শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তারাই কেবল মাদরাসার প্রয়োজনে সেখানে যেতে পারত। মাদরাসার সকল শিক্ষক ছিল ইংরেজ; যাদের হাদিস, ফিকহ, তাফসিরসহ ইসলামি বিভিন্ন জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় তারা ছিল দক্ষ। তারা অন্যদের মতো ভুল উচ্চারণ করত না; বিশুদ্ধ ভাষায়, বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলত ও লেখত। অসংখ্য ইংরেজ জজের ফারসি ভাষায় লিখিত রায় আজও ভারতের আদালতে সংরক্ষিত। এরা ছিল সেই গোপন মাদরাসার ফসল। কয়েক ডজন ইংরেজ শিক্ষক ও ইংরেজদের কয়েকশ বাচ্চাকাচ্চা মাদরাসায় অবস্থান করত। ছাত্র ও শিক্ষকদের ইউনিফর্ম ছিল একই ধরনের। তাদের ইউনিফর্ম ছিলো সাদা আবায়া, পাগড়ি, পায়জামা ও পানজাবি। মুখে দাড়িও ছিল। মুসলিমদের মতো কুশল বিনিময় ও চলাফেরা করত। এককথায় ভারতের মাদরাসাগুলোতে ছাত্র ও শিক্ষকরা যেভাবে চলতেন, যে ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন, তারাও হুবহু নকল করে চলত। তাদের বাহ্যিক অবয়ব, চালচলন ও বেশভূষা দেখে কিছুতেই অনুমান করা যেত না যে, এরা একেকজন কট্টর খ্রিস্টান।

যদি কোনোভাবে সেখানে যেতে পারলে মনে করবে, আলিমদের এই মুবারক জামাআত জমিন ভেদ করে বেরিয়ে এলো, নাকি আসমান থেকে অবতরণ করল! কী সুন্দর তাদের কথাবার্তা, কী সাদা ধবধবে পোশাক-পরিচ্ছদ! তাদের চালচলন ও বেশভূষায় মনে হয় এরা পূতপবিত্র ফেরেশতার দল! ছয়-সাত বছরের শিক্ষাজীবনে প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিফর্ম পরা ও উর্দু ভাষায় কথা বলা ছিল বাধ্যতামূলক। শিক্ষাজীবন চলাকালে মাতৃভাষা ইংরেজিতে কথা বলা তাদের জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল।

এভাবে ১৯ শতকের একেবারে শুরুর দিক থেকেই তারা ছাত্রদের তালিম-তারবিয়াত দিচ্ছিল। ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্রের গ্রন্থাদি তাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে। এসব গ্রন্থ থেকে ছাত্রদের ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি ও তার জবাব শেখানো হতো। সিলেবাস শেষ হয়ে গেলে ইসলামি বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন উপাধিতে তাদের ভূষিত করা হতো। তারপর তারা বিভিন্ন গির্জায় পাদরি হিসেবে কাজ করে বড় অঙ্কের অর্থ-ভাতা পেত অথবা ইংল্যান্ড সরকারের অধীনে তাদের পাঠানো হতো নিয়ন্ত্রিত অন্য দেশে।

উর্দু ভাষায় তাদের বক্তা, আরবি ও ফারসি ভাষায় গ্রন্থের লেখক, ইসলামি গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেওয়া, হাদিস ও তাফসিরে জারহ-তাদিল তথা হাদিসের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী বলে মনে করা হতো। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করা হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে ভারতে পাঠানো হয়। তাদের দায়িত্ব ছিল পুরো দেশে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে দেওয়া।

প্রতিষ্ঠানটি ১৯ শতকের শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরা আগ্রহ উদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহায় ভরপুর ছিল। যুবক পাদরিদের ভারতের সব এলাকায় নিয়োগ দেওয়া হয়। পশ্চিমে পেশোয়ার ও মুলতান থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে আসাম ও বাংলাদেশ পর্যন্ত তারা দাপিয়ে বেড়াত। রাজধানী দিল্লিতে ইংল্যান্ডের প্রধান পাদরি কার্ল গোটলিয়েব ফ্যান্ডার (Karl Gottlieb Pfander) পাদরিবাহিনীর নেতৃত্ব দিত। তাদের দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দিল্লির শাহজাহান জামে মসজিদের সিঁড়ি থেকে শুরু করে সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মজলিস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতে তখন প্রেস ছিল না, খ্রিষ্টান মিশনারিরাই প্রথম প্রেস চালু করে। সারধানা,[৩] আগ্রা, মির্জাপুর প্রভৃতি এলাকায় তাদের বড় বড় প্রেস ছিল। সেখানে দেখে দেখে নিয়োগ দেওয়া হতো কলমবাজ পাদরিদের। তারা উর্দু ভাষায় ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখে সেটা সারা দেশে বিনামূল্যে বিতরণ করত। বাজারে, মেলায়, ধর্মীয় বিভিন্ন তীর্থস্থান, মাহফিল ইত্যাদিতে গিয়ে তারা বই-পুস্তক বিলি করত। যেসব জায়গায় বিভিন্ন সময় ও উপলক্ষকে কেন্দ্র করে ভারতীয়রা জমায়েত হয়; যেমন হিন্দুদের বার্ষিক মেলা, তীর্থযাত্রা,

[৩] (Sardhana), বর্তমান ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মিরাট জেলার একটি শহর। — সম্পাদক।

মুসলিমদের জুমুআর নামাজ, ইদের নামাজ ইত্যাদি স্থান ও সময়ে তারা স্টল বসিয়ে বিনামূল্যে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা গ্রন্থ ও ইনজিলের ছোট ছোট কপি বিতরণ করত। এটা একটা সাধারণ আদেশ ছিল, যা সবসময়ই পালন করতে হতো। এ ছাড়াও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিত এবং খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরত।

সমস্ত সরকারি কর্মকর্তা, গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, কালেক্টর, ডেপুটি কালেক্টর ছিল পাক্কা খ্রিস্টান ও মিশনারি মানসিকতার, যাদের খ্রিস্টধর্ম প্রসারের জন্য এমনিতেই আগ্রহ থাকত। তারপরও সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কঠোর আদেশ দেওয়া হয়, যে এলাকায় পাদরিরা যাবে, সেখানে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, যাতে কেউ পাদরিদের সঙ্গে বিতর্ক সৃষ্টি করতে না পারে। মানুষকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করাতে যতটুকু লোভ-লালসা দেখানোর প্রয়োজন হয়, সেটা দেখানোর অধিকার তাদের দেওয়া হয়। হিন্দু কিংবা মুসলিমদের মধ্যে কেউ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তার সম্মান আর প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যেত। জুটে যেত সরকারি চাকরি ও বিভিন্ন পদ-পদবি। আরাম-আয়েশ আর ভোগবিলাসের যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা হতো এবং এটাও আদেশ ছিল যে, কোনো ভারতীয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তাকে পাদরির পদমর্যাদা দেওয়া হবে এবং খ্রিস্টধর্মের প্রচারে তাদের পরামর্শ নেওয়া হবে। আর বিশেষভাবে, যদি কোনো মুসলিম আলিম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাকে সরাসরি পাদরি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং তার জন্য পাদরির সমান বেতন-ভাতা দেওয়া হবে। পাদরি মহিউদ্দিন পেশোয়ারি, পাদরি সাফদার আলি, পাদরি নিয়াজ আলি, পাদরি আবদুল কারিম, পাদরি ইমাদ উদ্দিন প্রমুখ সেই সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। এরা আলিমদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বইপত্র লেখার ক্ষেত্রে ছিল অন্যদের চেয়ে এগিয়ে।

হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে যারা সরকারি চাকরিতে ছিল, প্রতি রবিবার ইংরেজ অফিসারের বাংলোতে গিয়ে পাদরিদের লেকচার শোনা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। সবাই এই আদেশ পালন করত। এই পন্থায় আশাতীত সাফল্য অর্জন করতে না পেরে সরাসরি সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত সকল হিন্দু ও মুসলিম কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আলাদা আলাদা চিঠি লিখে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে বলা হয়। তাদের কথামতো খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তো ভালো, নতুবা চাকরি থেকে তাদের বরখাস্তের হুমকি দেওয়া হয়। এতেও কাজ না হলে সব শেষে রাজধানী কলকাতায় বসবাসরত কোম্পানির পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রধান পাদরি এডমন্ড দেশবাসীর উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লেখে। চিঠিতে বলা হয়,

> *ভারতবাসী যেন তাড়াতাড়ি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়। অন্যথায় পরবর্তীকালে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে।*[৪]

[৪] আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ, স্যার সৈয়দ আহমাদ ও হায়াতে জাবেদ খাজা হালি।

এটা ছিল শেষ আল্টিমেটাম। এরপর যারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে গড়িমসি করবে তাদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করানো হবে। এত প্রকাশ্য আদেশ দেওয়ার পরও বিশাল ভারতবর্ষের কোনো প্রান্ত থেকে একটা ছোট্ট আওয়াজও বেরোতে দেখা যায়নি। এতে করে বেনিয়াদের এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, ভারতীয়দের আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছুই নেই। বিশেষভাবে মুসলিমদের ইমানি চেতনার বাতি নিভু নিভু হয়ে গেছে; সোনালি অতীত আর বর্ণালি ঐতিহ্য তাদের মনে নেই। এরা যে নিষ্প্রাণ, জীবন্মৃত জাতিতে পরিণত হয়েছে, তা বুঝতে আর বাকি থাকেনি। মুসলিমদের এই দুর্বলতার সুযোগে তারা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ দিল্লি জামে মসজিদকে গির্জা বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য চিন্তাভাবনা করতে থাকে। ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ইংল্যান্ড থেকে আর্চবিশপ পাদরি ফ্যান্ডারকে নিয়ে আসা হয়। পাদরি ফ্যান্ডার লন্ডনে থাকাকালে *মিজানুল হক* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে। সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই গ্রন্থ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। অধিকাংশ পাদরি এটাকে ইলহামি বা ঐশীবাণী বলে স্বীকৃতি দেয়। তারা বলেন,'এই গ্রন্থে প্রদত্ত অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করা মুসলিমদের পক্ষে অসম্ভব।'

চতুর্মাত্রিক প্রশংসার সাগরে ভাসতে ভাসতে পাদরি ফ্যান্ডারের পা মাটিতে নেই। সে একদম নিশ্চিত হয়ে গেল, ভারতের আলিমদের পক্ষে এই গ্রন্থের জবাব দেওয়া অসম্ভব। গ্রন্থটি নিয়ে সে ভারতে আসে এবং এখানকার আলিমদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলে, যদি ইসলাম সত্য ও সঠিক ধর্ম হয়ে থাকে, তাহলে কোনো মুসলিম আলিম যেন এই গ্রন্থের দলিল খণ্ডন করে জবাব দেন।'

এটা ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের কথা। তখন পুরো ভারতেই তাদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তারা পুরো দেশকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে আগ্রহী হয়। সারা দেশ ছিল তাদের হাতের মুঠোয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল আতঙ্ক। কারণ, তারা জানত পাদরি ফ্যান্ডারের সঙ্গে বিতর্ক করতে যাওয়া মানে সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এ জন্য কারও সাহস ছিল না তাদের মুখের ওপর কথা বলে। সাধারণ মানুষের কী আর করার থাকতে পারে, যেখানে খোদ দিল্লির সম্রাট লালকেল্লার চার দেয়ালের ভেতরে বন্দি হয়ে কোম্পানির দেওয়া ভাতা পেয়ে বেঁচে আছেন! কেল্লার দেয়ালের বাইরে তাঁর আওয়াজ বের হওয়ার সুযোগ ছিল না। দিল্লি তো বটেই; সঙ্গে পুরো দেশই এখন ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে। তখন সমগ্র ভারতে এমন একজন মানুষ ছিল না, যে পাদরি ফ্যান্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে। সেই সময়ে ভারতের মুসলিমরা এত অসহায় হয়ে পড়েন যে, তাদের চোখের সামনে বেনিয়ারা এত স্পর্ধা দেখাচ্ছিল; কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো একজন মানুষও ছিল না। এমন ক্রান্তিকালে,

মুসলিমদের এমন দুর্বিষহ সময়ে এক মর্দে মুসলিম, মুজাহিদে ইসলাম নিজের ইমানি আলোয় জ্বলে উঠলেন। তিনি ঘোষণা দেন, 'আমি পাদরি ফ্যান্ডারের সঙ্গে কথা বলব, তার সঙ্গে প্রকাশ্য জনসভায় বিতর্ক করব।' সেই মর্দে মুসলিম মুজাহিদে ইসলাম হলেন মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবি রাহ.।

পাদরিদের দৌরাত্ম্য এত বেড়েছিল যে, স্যার সৈয়দ আহমাদের মতো কোম্পানির একান্ত অনুগত লোকও এটা বলতে বাধ্য হয়েছেন, রাজধানী দিল্লিতে সরকারি চাকরিরত হিন্দু-মুসলিম সবার এই বিশ্বাস হয়ে দৃঢ় গিয়েছিল, আজ হোক আর কাল চাকরি রক্ষা করতে হলে অবশ্যই নিজের ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা চিঠি দিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের আদেশ পাঠানো হয়।

এ পর্যন্ত কেবল বলেই আসছিল কিন্তু জোরপূর্বক কাউকে ধর্মান্তরিত করা শুরু হয়নি। অবশ্য কলকাতায় বসে প্রধান পাদরি খোলা চিঠির মাধ্যমে সবাইকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে কড়া আদেশ দিয়েছিল। তার খোলা চিঠি পড়ে কিছু কমজোর ইমানদার খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং কিছু মানুষ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। সবাই ভয়ে ভয়ে দিনাতিপাত করছিল—না-জানি ইমান নিয়ে মরতে পারি কি না। সপ্তাহ-দুয়েকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে—যদি আমরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করি, তাহলে পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যাদের অন্তরে ইমানের তেজ ছিল, তারা এই কথা ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে লাগল। এমন কেউ ছিল না, যে তাদের পথ দেখাবে। এমন কেউ ছিল না, যার কাছে তারা ফরিয়াদ জানাবে। এই জুলুম ও জবরদস্তির বিরুদ্ধে কথা বলার মতো একটা মানুষও ছিল না। এমন ত্রাস ও ভীতিকর পরিস্থিতি ছিল যে, একজন মানুষও তাদের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করার সাহস ছিল না। নীরবে-নিভৃতে কাঁদাই তাদের ভাগ্যের লিখন হয়ে গেল। কারণ, এ ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না। ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে অসহায় হরিণ কিংবা হিংস্র পশুর সামনে বকরি যেমন ভয়ে কাঁপতে থাকে, তেমন অবস্থা হয়েছিল ভারতের মুসলিমদের। চোখের সামনে অন্ধকার দিন দিন বেড়েই চলছিল। এমন এক সময়ে সমস্ত ডর-ভয় উপেক্ষা করে, সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে তিনি মাঠে নেমে আসেন। সাহসী আওয়াজে পাদরি ফ্যান্ডারের মোকাবিলার ঘোষণা দেন।

পাদরি ফ্যান্ডারের জবাবে মাওলানার হুংকারের অর্থ এটাই যে, একত্ববাদে বিশ্বাসীদের দেহে প্রাণ থাকতে হিন্দুস্থানকে স্পেন বানানোর সুযোগ দেওয়া হবে না। তোমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, কোনো সময়ই তা বাস্তবায়িত হবে না। ত্রিত্ববাদের স্লোগান দিয়ে একত্ববাদের আওয়াজকে দাবিয়ে রাখতে, মসজিদ আর ইসলামের কেন্দ্রসমূহকে ত্রিত্ববাদের আড্ডাখানায় পরিণত করার ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবে না। ভারতের মাটিতে যতক্ষণ একজন একত্ববাদীও

বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের নাপাক খায়েশ পূরণ করতে দেবে না।

বলতে খুব সহজ মনে হলেও এ রকম ঘোষণা দেওয়া মোটেও সহজ ছিল না। কিন্তু এমন দুঃসাহসিক ঘোষণা দিয়ে কিরানবি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বেনিয়াগোষ্ঠীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, স্পেনের ভোগবিলাসে মত্ত শাসকগোষ্ঠী কাপুরুষের মতো আচরণ করেছে; কিন্তু হিন্দুস্থানের আলিমরা এত নিকৃষ্ট আর আত্মমর্যাদাহীন নন। এঁরা নুয়ে পড়েও যুদ্ধ করতে জানেন। প্রয়োজনে মরতে পারেন। এঁরা জীবনবাজি রেখে অবিরাম যুদ্ধ করা সিপাহি।

মুজাফফরনগর জেলার এক সাধারণ এলাকা কিরানার এই সিংহহৃদয় মুসলিমকে খুব কম মানুষই চিনত। কিন্তু সামান্য সময়ের ব্যবধানে শুধু ভারতেই নয়; সমগ্র মুসলিমবিশ্বে এবং বিশেষভাবে বললে পুরো ইউরোপে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কিংবদন্তিতুল্য অবদানের জন্য তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। কেননা, এমন এক কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে তিনি আওয়াজ বুলন্দ করেন, যখন কোনো আওয়াজ বেরোতে দেওয়া হতো না। অথচ এ রকম একটা আওয়াজ শুনতে পুরো হিন্দুস্থান কান পেতে বসেছিল।

এমন একজন মহামানব সম্পর্কে হিন্দুস্থানে খুব কমই আলোচনা করা হয়েছে। আজকাল জ্ঞানীগুণী এমনকি তাঁর একান্ত আপনজন ইলমে দীনের শিক্ষার্থীরাও তাঁর ঐতিহাসিক অনন্য অবদান সম্পর্কে খুব কমই জানেন।

উৎস ও রেফারেন্স

মাওলানার লিখিত গ্রন্থাদি আজ থেকে ১৫০ বছর আগে একবারই প্রকাশিত হয়েছিল, দ্বিতীয়বার প্রকাশের সুযোগ হয়নি। ফলে গ্রন্থগুলো দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। সে সময়ে বিতর্কের ঘটনা উর্দু ও ফারসিতে প্রকাশ করা হয়। *মুরাসালাতে মাজহাবি*, *মুরাসালাতুল বাহসিশ শারিফ* নামে প্রকাশিতও হয়েছিল। যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে প্রচলনের চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এগুলো কোনো লাইব্রেরিতে না কিনতে পাওয়া যায়; আর না কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে সেসবের সন্ধান পাওয়া যায়। আলোচ্য ঘটনাবলি জানতে যেসব গ্রন্থ দরকার, তা কুতুবখানা ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে? এ জন্য তখনকার ঘটনা অনুসন্ধান করা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি যে, মাওলানার বংশের এক সদস্য, মাদরাসায়ে সাওলাতিয়া, মক্কা মুকাররামার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ সালিম আজ থেকে ৭০ বছর আগে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা করাচি থেকে প্রকাশিত *নেদায়ে হারাম* পত্রিকার রজব-শাবান ১৩৭১—এপ্রিল-মে ১৯৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে মাওলানার ব্যক্তিত্ব, বংশ, পূর্বপুরুষের পরিচয়, বংশপরম্পরা, মোগল সম্রাটের কাছ থেকে জায়গির

লাভসহ অন্যান্য তথ্য উঠে এসেছে। এই মুহূর্তে আমার সামনে এই প্রামাণ্য প্রবন্ধ রয়েছে, যার দ্বারা মাওলানা সম্পর্কে যাবতীয় মৌলিক তথ্য জানতে পেরেছি।

একই সময়ে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম কারি মুহাম্মাদ তাইয়িব মাওলানার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণাধর্মী একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটিও *নেদায়ে হারাম* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটিও আমার সামনে রয়েছে। কারি সাহেবের প্রবন্ধ থেকে এমন কিছু তথ্য জানতে পারি, যা এর আগে আমার জানা ছিল না। কিছুদিন আগে আরবি ভাষায় *আল-মুবাহাসাতুল কুবরা* নামে একটি বড় আকারের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। লেখকের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ *ওল্ড টেস্টামেন্টের* দলিল ছিল। তাঁর গ্রন্থে বিতর্কের বিস্তারিত বিবরণ কম ছিল। অবশ্য আলোচ্যবিষয়, উভয় দলের বক্তব্য যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছেন। আমি এই গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থে বিতর্কের বিস্তারিত তথ্য পাইনি। আলোচ্যবিষয়ের ওপর বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থ থেকেই নিয়েছি। আমি অবশ্য কিছুটা সংক্ষেপ করেছি। কেননা, উর্দু-প্রেমিক প্রজন্ম আমার চোখের সামনেই ছিল, ফলে আমি সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হই।

সেই সময়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে খাজা হালি রচিত *হায়াতে জাবেদ*, স্যার সৈয়দ আহমাদ রচিত *আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ* এবং প্রফেসর গারসিন দে টাসির (Garcin de Tassy) *বয়ানসমগ্র* এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে। এই গ্রন্থ সব ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। এগুলোতে বাড়িয়ে বলার সম্ভাবনা নেই। এ জন্য তাদের সঙ্গে মতবাদের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স উল্লেখ করেছি, তাদের গ্রন্থ থেকে প্রচুর তথ্য গ্রহণ করেছি। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ও পরবর্তী সময়ের অবস্থা জানতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ এডওয়ার্ড থমসন কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ও উর্দুতে অনূদিত *গাদর ১৮৫৭: তাসবির কা দোসরা রুখ* আমার অধ্যয়নে আছে। সমস্ত ঘটনা এই গ্রন্থ থেকেই নিয়েছি। কোথাও সংক্ষিপ্ত কোথাও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে আমি কেবল নির্ভরযোগ্য সূত্রকেই অগ্রাধিকার দিয়েছি। তারপরও যদি কোনো ভুল বা কমবেশি পরিলক্ষিত হয়, সেটা আমার দুর্বলতা বলে গণ্য হবে।

নিজামুদ্দিন আসির আদরবি
জামিয়া ইসলামিয়া, বেনারস
১৩ আগস্ট, ২০০০